

অন্তরাল

এক অসমাপ্ত ভালোবাসা

আফরোজ মন্ডল

সেই সকালটা যেন একটু বেশি নীরব ছিল। শুভর চোখে ছিল একরাশ ভয়, অজানা রোমাঞ্চ। জীবনের প্রথম দিন সে পা রাখছিল মহাবিদ্যালয়ে-একটি নতুন জগৎ, যেখানে প্রতিটি করিডোরের মোড়ে লুকিয়ে আছে সম্ভাবনা, সংশয়, আর হয়তো... এক অসমাপ্ত ভালোবাসার গল্প।

মধ্যবিত্ত সংসারের গভীর মধ্যে বেড়ে ওঠা শুভকখনও কারও সঙ্গে মন খুলে কথা বলতে পারেনি। তার কথাগুলো প্রায়ই জমে থাকত বুকের ভিতর, একফোঁটা বারিধারার মতো।

কিন্তু আজ?

আজ থেকে শুরু হবে এমন এক অধ্যায়, যার শেষ পাতাটি হয়তো কখনও লেখা হবে না...

অধ্যায় ১: প্রথম প্রভাতে

শুভর চোখ খুলল এক অনুজ্জ্বল সকালে।

জানালার বাইরে রোদ তখনও জানে না যে সে উঠেছে কি না। ঘরের এক কোণে মা চুপচাপ ভাত বুনছেন, বাবার গলায় হালকা গুমোট কাশির শব্দ—সব মিলিয়ে খুব পরিচিত, খুব গৃহস্থ এক সকাল।

কিন্তু আজ শুভর মনে এক অচেনা কাঁপুনি।

কলেজে প্রথম দিন।

আজ এক নতুন দিগন্তের দোরগোড়ায় দাঁড়িয়ে শুভ।

চলমান জীবনের এই ব্যস্ত ও অস্থির পৃথিবীতে, সে প্রথমবারের মতো পা রাখতে চলেছে এক অজানা, কল্পনাপূর্ণ অধ্যায়ে—কলেজ জীবন।

স্মৃতিমেদুর স্কুল জীবনের সেই চেনা গণ্ডি পেরিয়ে আজ সে যাচ্ছে এমন এক জগতে, যেখানে কেউ তার পরিচিত নয়, কেউ জানে না সে কে।

এ যেন এক নতুন জন্ম, নতুন পরিচয় গড়ার সুযোগ।

তার চোখে স্বপ্নের রেখা, বুকে একরাশ দ্বিধা আর মনভরে এক অপার কৌতূহল—

কেমন হবে এই অচেনা পরিবেশ?

কেমন হবে তার প্রথম পা ফেলা সেই নিঃসন্দেহ অথচ অজানা পথে?

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে শুভ নিজের চোখে তাকায়—সে নিজেকে দেখতে পায়, অথচ চিনে উঠতে পারে না।

বাবা বলে ওঠেন, “সাইকেলটা তেল দিয়ে দিয়েছি। সাবধানে যাস।”

শুভ মাথা নাড়িয়ে চুপচাপ বেরিয়ে পড়ে। তার জামার পকেটে একটা পুরনো রুমাল আর বুকের ভেতরে এক গুচ্ছ অনুচ্চারিত ভয়।

কলেজের গেটটা যত কাছে আসে, শুভর পা যেন তত ধীর হয়ে আসে।



শুভর বুকের ভেতরটা যেন কেমন থমথমে লাগছিল। শব্দহীন এক নদী বয়ে চলেছে তার নিঃশব্দ হৃদয়ের গভীরে।

সে জানত, আজকের এই দিনটা শুধু নতুন ক্লাস, নতুন শিক্ষক বা সিলেবাস নয়—

এটা একটা নতুন জগতের শুরু।

যেখানে তাকে কথা বলতে হবে, হাসতে হবে, বন্ধু বানাতে হবে... অথচ সে নিজের নামটা উচ্চারণ করতেও কখনও সপ্রতিভ হতে পারেনি।

ওর গলায় যেন সবসময় কোনো অদৃশ্য ভার বাঁধা থাকে—যে ভার কেউ বোঝে না, কেউ বুঝতে চায় না।

কলেজ গেটের সামনে দাঁড়িয়ে শুভ একটু থেমে গেল। বাইক, হাসি, গলার জোরে কথা বলা ছেলে-মেয়েরা — যেন সব এক অন্য জগতের বাসিন্দা।

শুভ নিজের চটি জুতোর শব্দটাও লুকিয়ে ফেলতে চাইছিল।

ঠিক তখনই...

এক ঝলক চোখে পড়ল তাকে।

একটা মেয়ে, সাদা ও নীল শাড়ি পরা, চুলে ছোট একটা ক্লিপ, হাতে বইয়ের স্তুপ।

সে হাঁটছিল ধীরে, কিন্তু আত্মবিশ্বাসের ছায়া তার চলনে স্পষ্ট।

তার চোখ দুটো... যেন প্রশ্ন করে— "তুমি এই ভীড়ের অংশ হতে পারো?"

শুভ একটু গা চেপে সরে দাঁড়াল, যেন মেয়েটি তাকিয়ে ফেললেই তার ভিতরের লাজুকতাটা ছড়িয়ে যাবে বাতাসে।

মেয়েটি হালকা একটা হাসি দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। শুভ জানে না সেই হাসি তার উদ্দেশ্যে ছিল কি না, কিন্তু সে এটুকু জানে—এই হাসি আজ সারা দিন ওর মনে গেঁথে থাকবে।

শুভ প্রথম ক্লাসে বসল একেবারে পেছনের বেঞ্চে।

নতুন শিক্ষক এলেন, নাম বললেন, পাঠ্যবই খুললেন।

কিন্তু শুভর চোখ শুধু একবার তাকিয়ে দেখতে চাইছিল—মেয়েটি কোথায় বসেছে?

সে বুঝতে পারছে, কিছু একটা অজান্তেই শুরু হয়ে গেছে।

ঠিক কবে থেকে শুরু হবে এই গল্প, বা কবে শেষ হবে—সে জানে না।

জানে শুধু, তার মতো অন্তর্মুখী এক ছেলের ভিতরে যদি কখনো কারো জন্য হৃদয়ের কাঁপুনি জাগে—তবে সেটাও হয়তো ভালোবাসাই...

হয়তো তা না বলা ভালোবাসা।

হয়তো তা শুরু না হওয়া প্রেমের গল্প।

আর এই শুরুটাই হয়তো শেষ অবধি গিয়ে লিখবে সেই অধ্যায়,

...যার শেষ পাতাটি হয়তো কখনও লেখা হবে না।

সেই দিন ক্লাসে শিক্ষক কী বললেন, শুভর কিছুই মনে নেই।

শুধু মনে আছে, পাশের বেঞ্চ থেকে একবার ভেসে এসেছিল মেয়েটির খসখসে চুলে কাচের ক্লিপের শব্দ, আর সামান্য কাশির আওয়াজ।

সে বারবার চেয়েছিল তাকাতে।

কিন্তু তাকানোর সাহস হয়নি।

শুভর মনে হচ্ছিল—যদি একবার চোখাচোখি হয়, তবে মেয়েটি বুঝে যাবে, তার চোখে কেমন কাঁচের মতো এক মনের দৃষ্টি জমে আছে।

মেয়েটির নাম জানে না সে।

জানে না সে নতুন ছাত্রী, না কি পুরনো কেউ।

তবে এতটুকু বোঝে, মেয়েটির চোখে ছিল এমন কিছু, যা শুভকে জীবনে প্রথমবার নিজের সীমাবদ্ধতা মনে করিয়ে দিল।

ক্লাস শেষে সবাই দল বেঁধে বাইরে বেরিয়ে গেল। কেউ মজা করছিল, কেউ পরিচয় বিনিময়ে ব্যস্ত।

শুভ একা দাঁড়িয়ে ছিল করিডোরের এক কোণে, বইয়ের ভেতর মুখ গুঁজে।

হঠাৎ...

“এই... তুমি কি নতুন?”

মেয়েটির কণ্ঠস্বর যেন হালকা বাতাসে ভেসে আসা বেগুগান।
শুভ চমকে তাকাল।

সে—তাকাল?

হ্যাঁ, তাকিয়েই দেখল সেই মেয়েটি দাঁড়িয়ে আছে, চোখে অদ্ভুত এক হাসি।

“আমি... হ্যাঁ...”, — শুভর গলা শুকিয়ে গিয়েছিল।

মেয়েটি আর কিছু না বলে হাসল। শুধু বলল, “আমি অনন্যা। দেখা হবে।”

তারপর সে চলে গেল।

শুভ কিছু বলতে পারেনি। দাঁড়িয়ে রইল নিঃশব্দ, অথচ বুকের মধ্যে যেন হাজারটা শব্দের শব্দগুচ্ছ ঝড় তুলছিল।

সে জানত না, এই এক মুহূর্তই একদিন তার জীবনের সবচেয়ে বেশি মনে থাকার মুহূর্ত হয়ে উঠবে।

আর শুভর মন সেই নামেই আটকে গিয়েছিল, যেমন কোন এক অজানা গানে প্রথমবার শোনা সুর মন ছুঁয়ে যায়
— বোঝা যায় না কেন ভালো লাগে, শুধু লাগে।

সেদিন বিকেলে বাড়ি ফিরেও শুভ চুপচাপ ছিল।
মা বারবার জিজ্ঞেস করছিলেন —
“কী রে, কলেজ কেমন লাগল? বন্ধুবান্ধব পেলি?”

শুভ হেসে এড়িয়ে গেল। সে জানে, যা বলার, তা ভাষায় বলা যায় না।

একটা নাম... একটা হাসি... আর এক ঝলক চোখাচোখি — এইটুকুই আজ তার পুরোদিনের গল্প।

শুভর মনে মনে ভাবনা:

শুভ জানে, সে ভেতরের মানুষ। বাইরের জগতে খুব বেশি কথা বলে না।
কিন্তু ভেতরে?
সেখানে তো কথা থামে না...

কলেজের পরদিন, আর তারও পরদিন — শুভ প্রতিদিন তাকিয়েছিল করিডোরের বাঁদিকে, যেখানে অনন্যা
দাঁড়িয়ে থাকত হয়তো বন্ধুদের সঙ্গে, কখনো একা।

শুভ শুধু দূর থেকে দেখত।
সে জানত, ভালোবাসা এত দ্রুত হয় না। কিন্তু সে এটাও জানত — এই মেয়েটি তাকে বদলে দিচ্ছে।

তার মধ্যে একটা অস্থিরতা কাজ করছিল।

সে চুপচাপ হলেও — সে ভালোবেসে ফেলেছে।

ক্লাসের ফাঁকে সবাই ক্যানটিনে ব্যস্ত, কেউ চিপস, কেউ মোবাইলে ভিডিও।
শুভ নিজের মতো ছাদে উঠে গিয়েছিল।
সেখানে দাঁড়িয়ে সে বই খুলে পড়ছিল, যদিও পাতা বদলাচ্ছিল না।

হঠাৎ, পেছনে শুনতে পেল কণ্ঠস্বর –

“তুমি সবসময় এত চুপচাপ থাকো কেন?”

শুভ ঘুরে তাকাল।

অনন্যা।

সে হাসছে না, চোখে প্রশ্ন।

শুভ কিছু বলার আগেই অনন্যা আবার বলল,

“তুমি গিটার বাজাও?”

শুভ চমকে উঠল।

“তুমি জানলে কী করে?”

“তোমার ব্যাগে পিকটা দেখেছিলাম সেদিন ক্লাসে।”

শুভ অপ্রস্তুত হেসে বলল, “বাজাতাম... এখন আর তেমন পারি না।”

অনন্যা মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, “মিথ্যে বলো না। তুমি বাজাও, আর ভালোই বাজাও। আমি শুনতে চাই।”

অন্তর থেকে কিছু খুলে যাওয়া:

সেই মুহূর্তে শুভর মনে হলো, যেন কেউ তার ভেতরের তালা খোলার চাবিটা খুঁজে পেয়েছে।
এতদিন কেউ কিছু জিজ্ঞেস করেনি, কেউ আগ্রহ দেখায়নি, কেউ চোখে চোখ রাখেনি এভাবে।

শুভ বুঝল – এই মেয়েটা আলাদা।

ওর হাসি যেন শ্রাবণের প্রথম বৃষ্টি।

আর ওর প্রশ্নগুলো – শুভর একাকীত্বের ভেতর দীর্ঘদিন পরে প্রথম কোনো শব্দ।

অধ্যায় ২ :

সেদিনের পর থেকে কলেজে শুভকে আর আগের মতো একা লাগত না।

অনন্যা মাঝে মাঝে এসে কথা বলত—কখনও বই নিয়ে, কখনও স্যারদের নিয়ে ঠাট্টা করে, আবার কখনও চুপচাপ শুভর পাশে দাঁড়িয়ে থাকত।

শুভ সেই নীরব সঙ্গ পেত।

সে ভেবেছিল, এটাই বুঝি বন্ধুত্ব।
আবার কখনও, এটাই বুঝি ভালোবাসা।

কিন্তু অনন্যা?

ওর মধ্যে যেন একটা দূরত্ব ছিল—স্নিগ্ধ অথচ অস্পষ্ট।

শুভ বুঝত না, সে কি সত্যিই শুভর দিকে এগিয়ে আসছে, নাকি কেবল বন্ধুত্বের ভেতরে সেই হাসিটুকু দিয়ে শুভকে শান্ত রাখছে?

কখনো কখনো অনন্যা ক্যানটিনে এক বন্ধুর সঙ্গে বসত, হাসত—তখন শুভর বুকটা একটু ভার হয়ে উঠত।

একদিন, শুভ সাহস করে জিজ্ঞেস করল—

“তোমার প্রিয় গান কী?”

অনন্যা মুচকি হেসে বলেছিল,
“যে গান শুনে চোখ বুজলে কেউ একজন মনে পড়ে—সেইটাই।”

শুভ কিছু বলতে পারেনি।

তার মনে হচ্ছিল, সে সেই ‘কারো একজন’ নয়।

দিন কাটতে লাগল। অনন্যা কখনও খুব আপন, কখনও দূরের তারা।
শুভ শুধু দেখত... অপেক্ষা করত...

কিন্তু কিছু বলত না।

হয়তো এই না বলাটাই ছিল তার সবচেয়ে বড় ভুল।

অথবা... এই চুপচাপ ভালোবাসাটাই ছিল সবচেয়ে খাঁটি।

উপসংহার

বহু বছর পর শুভ একদিন কলেজ গেটের সামনে দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিল।
করিডোরের ওই কোণটা, ছাদে দাঁড়িয়ে থাকা সেই ছায়া, আর সেই মুচকি হাসি—
সব যেন আজও রয়ে গেছে...

শুধু সেই নামটাই আর শোনা যায় না —
অনন্যা।

আর একটা গল্প—
যেটা শুরু হয়েছিল চুপিচুপি,
আর শেষ হয়ে গিয়েছিল...
একেবারে না বলে।

সময় এগিয়ে যাচ্ছে।
ক্লাস, পরীক্ষা, হাসি-মজা—সব চলছে চারপাশে।

কিন্তু শুভর ভেতরটা যেন সেই প্রথম দিনের করিডোরেই আটকে আছে।

অনন্যা মাঝে মাঝে আসে, কথা বলে।
কিন্তু দিন দিন শুভ বুঝতে পারছে, অনন্যা আগের মতো নেই।

তার হাসিতে এখন আর সেই আগ্রহটা নেই। তার চোখ অন্য কিছু খোঁজে যেন।

একদিন ক্যানটিনের কোণে শুভ দেখল—অনন্যা আরেক ছেলের সঙ্গে দাঁড়িয়ে গল্প করছে।
ছেলেটা সম্ভবত কলেজের বিতর্ক ক্লাবের সক্রিয় সদস্য। আত্মবিশ্বাসে ভরপুর।

শুভ একটু দূর থেকে তাকিয়েছিল।

তারা একসাথে হাসছে।
ছেলেটি অনন্যার হাতে একটা চকলেট দিচ্ছে।

অনন্যা একবার তাকাল, শুভর দিকে।

কিন্তু...
তার চোখে কোনো অপরাধবোধ ছিল না।

শুভর বুকের ভিতরে জমে থাকা শব্দগুলো যেন আরও একবার স্তব্ধ হয়ে গেল।

সে ভাবল,

“আমি তো কিছু বলিনি কখনও...
তাহলে আমি কী চাইছি?
কেন ঈর্ষা করছি?”

সে নিজেকেই প্রশ্ন করে...
কিন্তু উত্তর পায় না।

---একাকীত্বের গভীরে ডুবে থাকা শুভ:

রাতে গিটার হাতে বসে শুভ একটা সুর তুলতে চেষ্টা করে।

সুরটা বারবার ভেঙে যায়।

গানের কথাগুলো উঠে আসে মনে, কিন্তু কণ্ঠে জমে থাকে।

বারান্দার দিকে তাকিয়ে, সে শুধু মনে মনে বলে—

“অনন্যা, যদি একবার জানাতে পারতাম...”

কিন্তু ততদিনে খুব দেরি হয়ে গেছে।

হয়তো সে শুধু একজন শ্রোতা হয়েই থাকবে।
একজন দর্শক, যে নিজের জীবনের নাটকে অভিনয়ই করতে পারেনি।

অধ্যায়ের শেষ অংশ:

পরদিন, ক্লাস শেষে করিডোরে অনন্যা শুভর পাশে এসে দাঁড়ায়।

একটু হাসে।

বলে,

“তুমি তো কিছুই বলো না। চুপচাপ থাকো সবসময়।”

শুভ চুপ থাকে।

চোখ তুলে শুধু একবার তাকায়, আবার নিচু করে নেয়।

সে জানে, আজও সে কিছু বলতে পারবে না।

আর এই না বলাটাই হয়তো একদিন তাকে শূন্য করে দেবে।



অধ্যায় ৩ :

অনন্যা শুভকে যতটা সহজভাবে কথা বলার সুযোগ দিয়েছিল শুরুতে, দিন দিন সেই জগতটা ছোট হয়ে আসছিল।

এখন অনন্যা যেন ব্যস্ত।

নোটস, ক্লাস, নতুন বন্ধুদের মাঝে সে অনেক সময় শুভকে খুঁজেই পায় না।

শুভও নিজেকে ধীরে ধীরে গুটিয়ে নিচ্ছে।

যেন বুঝে ফেলেছে—সব গল্প শেষ পর্যন্ত প্রেমে বদলায় না।

কিছু গল্পের শেষে শুধু অপ্রকাশিত অনুভব জমে থাকে,
যেমন পুরনো ডায়েরির পাতায় লেখা কিছু লাইন—
যেগুলোর পাঠক কেউই হবে না।

একটি শীতল সন্ধ্যার গল্প...

দিনটি ছিল মেঘলা।

ক্লাস চলছিল না, কোনো সেমিনারের জন্য ক্লাস বাতিল।

শুভ ছাদের কোণায় বসেছিল, পাশে তার পুরনো খাতাখানি আর কলম।
কিছু লিখছিল—না, কবিতা নয়। তার নিজের কথা, যা কাউকে বলা হয়নি কখনো।

হঠাৎ পেছন থেকে কণ্ঠস্বর:

— “তুমি জানো, আমি একদিন হঠাৎ চলে যেতে পারি।”

শুভ ঘুরে তাকাল—অনন্যা।

তার মুখে ছিল একরকম ক্লান্তির ছায়া।

— “কোথায় যাবে?”

— “জানি না। বাবার বদলি হতে পারে। অথবা কিছু দিন ছুটি নেব।”

শুভ কিছু বলল না।

শুধু একটা দীর্ঘশ্বাস বুকের ভেতর কেটে গেল।

সে চাইল বলতে — “তুমি চলে গেলে আমি অনেক কিছু হারাব।”

কিন্তু...

সে বলল না।

শুধু একটা ছোট প্রশ্ন করল—

— “তোমার যাওয়ার আগে আমি কিছু বলতে পারি?”

অনন্যা তাকিয়ে রইল কিছুক্ষণ।

হালকা মাথা নেড়ে বলল — “হ্যাঁ, বলতে পারো।”

-- কিন্তু শুভ কিছুই বলতে পারল না... তখনো না।

সে শুধু হাসল ---

সেই চিরপরিচিত চাপা হাসি—যেটা সে মুখোশ হিসেবে পরে রাখে নিজের আবেগ ঢাকতে।

অনন্যা চলে গেল।

শুভ নিজের খাতাটা বন্ধ করল।

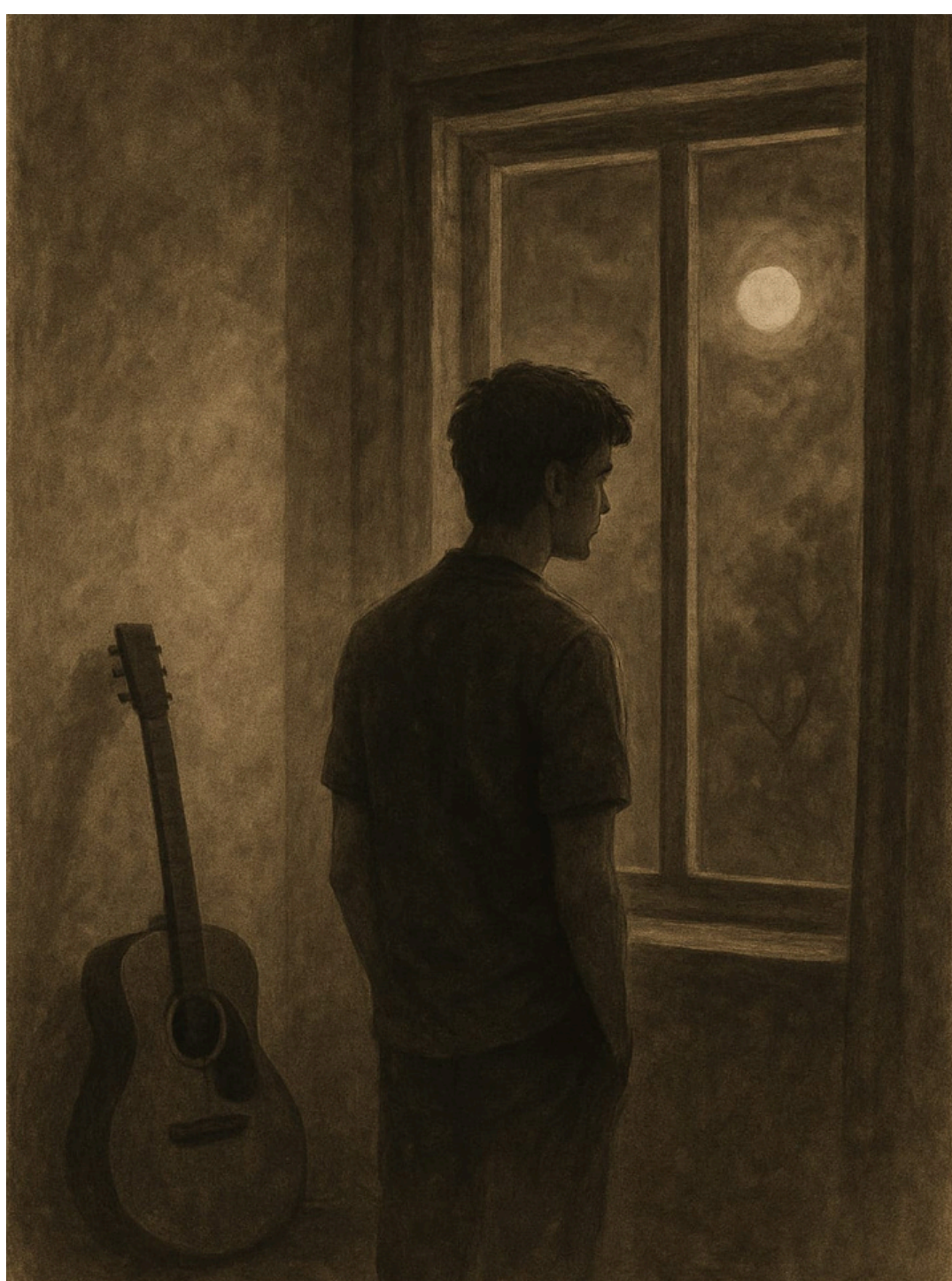
পৃষ্ঠার এক কোণে লেখা ছিল এক লাইন—

“তুমি বললে চলে যাবে, কিন্তু আমি তো আর কারো গল্পের নায়ক নই...”

সে রাতে শুভ আর গিটার হাতে নিল না।
শুধু জানালার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল।

একটা বাতাস বইছিল—ঠান্ডা, নীরব, অথচ বোঝাতে চাচ্ছে...
কিছু হারানো আসন্ন।

এবং এটাই সেই সময়,
যখন না বলা কথাগুলো নিজেদের মধ্যে একে একে ছায়া হয়ে যায়।



পরদিন সকালটা একটু ব্যতিক্রমী ছিল।
কলেজে ঢুকেই শুভ লক্ষ্য করল, করিডোরে অনন্যা নেই।
ক্যানটিনে নেই, লাইব্রেরিতেও না।

শুভর ভেতরে এক অজানা ভয় ঢুকে পড়ল।

ক্লাসে ঢুকে সবাই নিজেদের মতো ব্যস্ত।
এমন সময় শুভর এক সহপাঠী বলল—

— “শুনেছিস? অনন্যা আজকে আসেনি। কাল নাকি ওর বাবা ট্রান্সফারের চিঠি পেয়েছেন। সম্ভবত এই সপ্তাহেই
চলে যাচ্ছে।”

শুভর বুকের ভিতরটা যেন এক মুহূর্তে খালি হয়ে গেল।

সে উঠে দাঁড়াল, কিছু বলল না কারো সঙ্গে।
বেরিয়ে পড়ল, হাঁটতে লাগল... যেন পেছনে পড়ে রইল সব কিছু।

একটা শেষ চেষ্টা...

বিকেলে শুভ গেল সেই ছাদে, যেখানে একদিন অনন্যা বলেছিল, “তুমি সবসময় চুপ থাকো কেন?”
চারদিকে নীরবতা।
শুধু হাওয়ার শব্দ আর বুকের ভিতরের বেদনার আওয়াজ।

শুভ নিজের খাতাটা খুলল।
আর তাতে একটিমাত্র লাইন লিখল—

“অনন্যা, আমি চেয়েছিলাম কিছু বলতে... কিন্তু তুমি শোনার আগেই চলে গেলে।”

সে জানে, কেউ এই পাতা পড়বে না।

তারপর একটানা বসে রইল, সূর্য ডুবে যাওয়া পর্যন্ত।

শেষ দৃশ্য:

কলেজ গেটে দাঁড়িয়ে ছিল শুভ, শেষবারের মতো।
গাড়ি চলল, হঠাৎ সে এক ঝলকে দেখতে পেল—অনন্যা গাড়ির জানালার পাশে বসে।

শুভ হাত তুলতে চেয়েছিল... কিন্তু তুলল না।

শুধু তাকিয়ে রইল।

আর অনন্যা?

সে জানালার কাছে মাথা ঠেকিয়ে রেখেছিল।
চোখ দুটো বন্ধ...
কে জানে, হয়তো কিছু অনুভব করেছিল।

শেষ দৃশ্য:

কলেজ গেটে দাঁড়িয়ে ছিল শুভ, শেষবারের মতো।
গাড়ি চলল, হঠাৎ সে এক ঝলকে দেখতে পেল—অনন্যা গাড়ির জানালার পাশে বসে।

শুভ হাত তুলতে চেয়েছিল... কিন্তু তুলল না।

শুধু তাকিয়ে রইল।

আর অনন্যা?

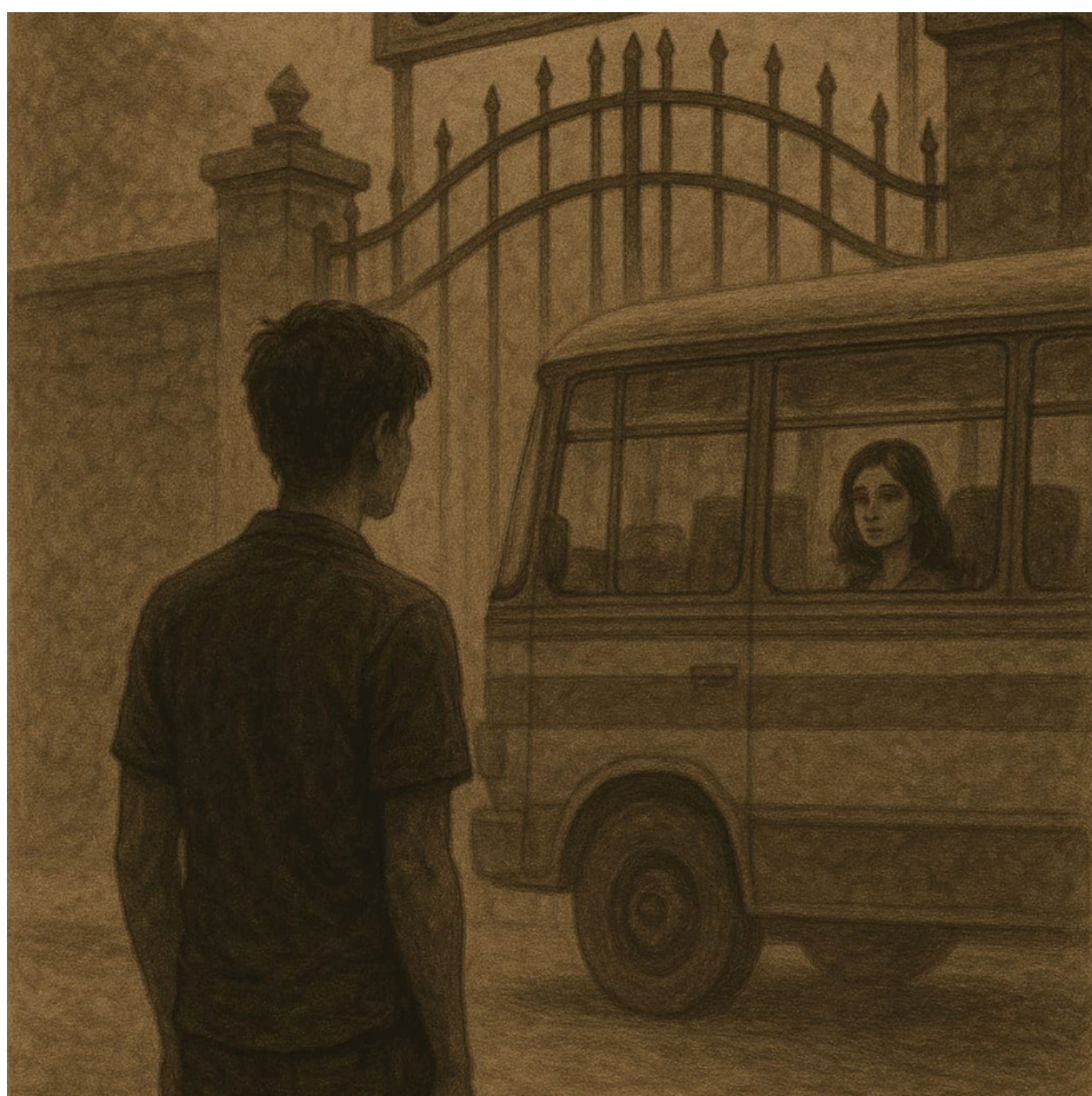
সে জানালার কাছে মাথা ঠেকিয়ে রেখেছিল।
চোখ দুটো বন্ধ...
কে জানে, হয়তো কিছু অনুভব করেছিল।

কিন্তু সেই চোখ আর খোলেনি।

উপসংহার (অধ্যায় ৩ : শেষ)

কিছু ভালোবাসা শব্দ পায় না,
কিছু বিদায় কাঁদতে পারে না,
আর কিছু গল্প...
শুধু চুপচাপ হারিয়ে যায়।

শুভর জীবনে অনন্যা ছিল, আছে...
কিন্তু “থাকা” আর “পাওয়া” যে এক জিনিস নয় —
সেটা ও আজ ঠিক বুঝে গেল।



অধ্যায় ৪ :

সময় যেন চলছিল না,
শুধু ঠায় দাঁড়িয়ে ছিল কোনো এক পুরনো ঘড়ির কাঁটা হয়ে...
শুভর জীবনে।

অনন্যা চলে যাওয়ার পর কলেজে দিনগুলো একঘেয়ে, রংহীন হয়ে গেল।

যে করিডোরে সে দাঁড়াত, এখন সেখানেও দাঁড়ায় না।
ক্লাসে মন বসে না।
সহপাঠীরা যখন গল্প করে, হাসে — শুভ তখন জানালার বাইরে তাকিয়ে থাকে।

সে জানে, তার জীবনে একটি অধ্যায় শেষ হয়ে গেছে।

কিন্তু প্রশ্ন একটাই —
এই ‘শেষ’টা কি আদৌ শেষ?

নাকি এটি ছিল এক অসম্পূর্ণ বিদায়?

একটা হঠাৎ দেখা...

একদিন বিকেলে শুভ কলেজের পুরনো গেট দিয়ে বের হচ্ছিল, তখন হঠাৎ শুনতে পেল একটা কণ্ঠস্বর—

— “শুভ?”

শুভ থেমে গেল।
ঘুরে তাকাল।

সে... অনন্যা।

হাতে ট্রলি ব্যাগ, চোখে চশমা, পরনে একদম সাদামাটা সালোয়ার।

কয়েক মুহূর্ত চুপচাপ তাকিয়ে থাকল দুজন।

— “তুমি... এখানে?”
— “হ্যাঁ, একদিনের জন্য এসেছি। কিছু কাগজ আনতে হয়েছে বাবার অফিসে।”

শুভ কিছু বলতে পারছিল না।

— “কেমন আছো?”
— “ভাল।”

কিন্তু এই “ভাল” শব্দটার পেছনে কতটা অভিমান, অপ্রকাশিত ব্যথা জমে ছিল—
সেটা বোঝা যেত শুধু যদি অনন্যা ঠিক করে শুনতে পেত।

— “তুমি বলবে না কিছু?”

শুভ তাকাল...
সে চাইল বলতে, “তোমার না থাকাটা আমি আজও ভুলিনি...”

কিন্তু...
আবারও সে চুপ করে গেল।

শেষ বিদায়...

অনন্যা বলল, “আজ বিকেলের ট্রেনে ফিরব। যদি সময় থাকে, ছাদে এসো একবার।”

শুভ মাথা নাড়ল।

কিন্তু সে যায়নি।

সে জানালার পাশে দাঁড়িয়ে ছিল।

ছাদের দিকে তাকিয়ে দেখল—অনন্যা একা দাঁড়িয়ে আছে।

সময় পেরিয়ে গেল।

অনন্যা একবার তাকাল আকাশের দিকে, তারপর নিচে, তারপর চলে গেল।

শুভ জানে...

এটাই শেষ দেখা।

এবং এবার...

কোনো সুযোগ আর আসবে না।

উপসংহার (অধ্যায় ৪ : শেষ)

জীবনে কিছু মুহূর্ত থাকে,
যেগুলো বলা যায়, বোঝানো যায়...
কিন্তু বলা হয় না।

শুভ হয়তো অনেক কিছু বলতে পারত।

কিন্তু আজ যখন সে জানালার ধারে বসে গিটার নিয়ে বাজায়,
তার সুরগুলো যেন সব সময়...
একটি অসম্পূর্ণ গল্পের প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে আসে।

অধ্যায় ৫ :

কলেজ ক্যানটিনে এক কোণে একটা পুরনো বেঞ্চ...

যেখানটায় আগে অনন্যা বসত, এখন সেটা খালি থাকে।
কেউ বসে না সেখানে, যেন অদৃশ্যভাবে জায়গাটা কারো জন্য বরাদ্দ।

শুভ প্রতিদিন তাকায় সেই বেঞ্চের দিকে।
প্রতিদিন না গিয়ে থেকেও যেন একবার চোখে দেখে নেয়।

এইভাবেই চলে যাচ্ছে দিনগুলো।

একটা পুরনো খাতার পাতায়...

বাড়িতে তার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে রাখা একটা খাতা।
অনেক দিন কেউ ছুঁয়েও দেখেনি।

শুভ সেই খাতা খুলে মাঝে মাঝে লিখে।

লিখে, কিন্তু কাউকে দেখায় না।

তার প্রতিটি পাতায় লেখা—

“প্রিয় অনন্যা,”

কখনও বলে —

“তুমি চলে যাওয়ার পরও আমি প্রতিদিন অপেক্ষা করি... যদিও জানি তুমি ফিরবে না।”

আবার কখনও —

“তোমার পছন্দের সেই গানটা শুনলে আজও বুকটা ভার হয়ে আসে।”

কিছু চিঠি এমনও আছে, যেগুলোর শেষ নেই।

শুধু শুরু —

“আজ কলেজে সেই করিডোর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম...”

তারপর আর কোনো শব্দ নেই।

শুধু ফাঁকা পাতা।

একটা গান...

একদিন সন্ধ্যায় গিটার হাতে শুভ একটা পুরনো সুর তুলল।

সুরটা খারাপ ছিল না।

কিন্তু হঠাৎ...

সুর ভেঙে গেল মাঝপথে।

কলেজ ক্যানটিনে এক কোণে একটা পুরনো বেঞ্চ...

যেখানটায় আগে অনন্যা বসত, এখন সেটা খালি থাকে।
কেউ বসে না সেখানে, যেন অদৃশ্যভাবে জায়গাটা কারো জন্য বরাদ্দ।

শুভ প্রতিদিন তাকায় সেই বেঞ্চের দিকে।
প্রতিদিন না গিয়ে থেকেও যেন একবার চোখে দেখে নেয়।

এইভাবেই চলে যাচ্ছে দিনগুলো।

একটা পুরনো খাতার পাতায়...

বাড়িতে তার পড়ার টেবিলের ড্রয়ারে রাখা একটা খাতা।
অনেক দিন কেউ ছুঁয়েও দেখেনি।

শুভ সেই খাতা খুলে মাঝে মাঝে লিখে।

লিখে, কিন্তু কাউকে দেখায় না।

তার প্রতিটি পাতায় লেখা—

“প্রিয় অনন্যা,”

কখনও বলে —

“তুমি চলে যাওয়ার পরও আমি প্রতিদিন অপেক্ষা করি... যদিও জানি তুমি ফিরবে না।”

আবার কখনও —

“তোমার পছন্দের সেই গানটা শুনলে আজও বুকটা ভার হয়ে আসে।”

কিছু চিঠি এমনও আছে, যেগুলোর শেষ নেই।

শুধু শুরু —

“আজ কলেজে সেই করিডোর দিয়ে হেঁটে গিয়েছিলাম...”

তারপর আর কোনো শব্দ নেই।

শুধু ফাঁকা পাতা।

একটা গান...

একদিন সন্ধ্যায় গিটার হাতে শুভ একটা পুরনো সুর তুলল।

সুরটা খারাপ ছিল না।

কিন্তু হঠাৎ...

সুর ভেঙে গেল মাঝপথে।

সে ফিসফিস করে বলল—

“এই সুরটা আমি তোমার জন্য বানিয়েছিলাম, অনন্যা। কিন্তু তুমি কোনোদিন শুনলে না।”
একটা চোখের কোণ ভিজে উঠল...
কেউ দেখল না।

একটা চিঠি, যেটা কখনও পাঠানো হয়নি...
এক রাতে শুভ নিজের সব সাহস জড় করল।

পুরনো খাতা থেকে একটা চিঠি ছিঁড়ে বের করল।

খামে ভরল।
অনন্যার পুরনো ঠিকানা লিখল।

কিন্তু...
পোস্টবক্স পর্যন্ত গিয়ে থেমে গেল।

সে দাঁড়িয়ে থাকল, খামটা হাতে।

তারপর আবার খামটা পকেটে ভরে নিল।

ভাবল—

"তুমি এই চিঠিটা পেলে কী করো? হয়তো কিছুই না।"

উপসংহার: (অধ্যায় ৫ : শেষ)

কিছু সম্পর্ক চিঠির মতো—
লেখা হয়, মন থেকে লেখা হয়...

কিন্তু কখনও পাঠানো হয় না।

শুভ জানে—অনন্যা তার জীবনের ‘ক্লাইম্যাক্স’ নয়,
বরং একটা অলিখিত অধ্যায়,
যেটা সে একা একাই লিখে যাবে...

যতদিন বেঁচে থাকবে সে ফাঁকা বেঞ্চটা।

অধ্যায় ৬ : নতুন ছায়া, পুরনো আলো

সময় অনেক কিছু ভুলিয়ে দেয়...

কিন্তু কিছু কিছু অনুভূতির ভিতর সময় থেমে থাকে।

শুভর জীবনেও সময় এগিয়েছে।
পরীক্ষা, ক্লাস, ব্যস্ততা—সব চলছে।

কিন্তু ভিতরের শূন্যতা?
সেটা ঠিক আগের মতোই রয়ে গেছে।

একটা হঠাৎ পরিচয়...

কলেজ লাইব্রেরির কোণায় বই খুঁজছিল শুভ।

হঠাৎ এক কণ্ঠস্বর—

— “এই বইটা যদি পড়ে থাকো, তবে আমার রিভিউটা শুনে নিও।”

শুভ তাকিয়ে দেখল, এক মেয়ে—

মুখে মিষ্টি হাসি, চোখে স্পষ্ট আত্মবিশ্বাস।
নাম—মেহরিন।

ইংরেজিতে অনার্স, বিতর্ক ক্লাবের সদস্য, কথা বলতে ভালোবাসে।

প্রথমবার শুভ একটু অপ্রস্তুত হলেও, পরের দিন থেকেই তারা দেখা করতে থাকে লাইব্রেরিতে, করিডোরে, ক্যানটিনে।

শুভর দ্বিধা...

মেহরিন স্পষ্টভাবে শুভর প্রতি আগ্রহ দেখায়।

কিন্তু শুভর মন বারবার ফিরে যায় অনন্যার দিকে।

সে ভাবে—

“আমি কি নিজেকে প্রতারণিত করছি?
না কি মেহরিন সত্যিই একটা নতুন আলো?”

রাতে ডায়েরিতে লিখে—

“যে আলো চোখে পড়ে, সে কি সত্যিই উষ্ণতা দেয়?”

মেহরিন ওর পাশে থাকলে শুভর ভালো লাগে,
কিন্তু সেই ধুকপুকানিটা—যেটা অনন্যাকে দেখলে হতো—
সেটা আসে না।

একদিন মেহরিন বলে...

“তুমি এখনো কারো অপেক্ষায় আছো, তাই না?”

শুভ চমকে ওঠে।

“কেন বলছ?”

“কারণ, তুমি যখন তাকাও, চোখে অতীত ঝলসে ওঠে। ভবিষ্যৎ নয়।”

শুভ চুপ থাকে।

তারপর শুধু বলে—

“হয়তো আমি কাউকে এখনও যেতে দেইনি।”

মেহরিন হেসে ফেলে।

“আচ্ছা, আমি থাকি না? যতক্ষণ না তুমি নিজেকে খুঁজে পাও, আমি পাশে থাকব।
চাইলে বন্ধুত্বই হোক, তাও থাকব।”

শুভ জানে—মেহরিন অনন্যা নয়।

কেউ কাউকে প্রতিস্থাপন করতে পারে না।

কিন্তু কিছু মানুষ আসে ভাঙা জায়গাগুলোতে নতুন আলো দিতে।

শুভ প্রথমবার ভাবল—

“হয়তো জীবনটা এখান থেকেই আবার শুরু হতে পারে।
ধীরে, কিন্তু সত্যি...”

এক নতুন ছায়ার পাশে দাঁড়িয়ে, পুরনো আলোর দিকে তাকিয়ে।



দুপুরের রোদটা আজ একটু অন্যরকম। কলেজের ক্যানটিনে বসে শুভ একটা বই পড়ছিল।
মেহরিন তখনও আসেনি। এমন সময় কেউ একজন ডাকল—

— “তোমার নাম শুভ, তাই তো?”

শুভ তাকাল।
পোস্টম্যান।

হাতে এক খাম।

— “তোমার নামে একটা চিঠি এসেছে। হাতে ধরিয়ে দিতে বলা হয়েছিল।”

শুভ ধীরে ধীরে খামটা হাতে নিল।

প্রেরক—অনন্যা।

চিঠির ভাষা...

শুভ,

জানি, চিঠি পেয়ে তুমি অবাক হবে। এতদিন কিছুই জানাও দিইনি। তবু আজ লিখতে বাধ্য হলাম।

জানো?

তোমার কথা কখনও ভুলিনি। কলেজের সেই করিডোর, সেই ছাদ ক্যানটিনের হাসি...

সব আজও মনে পড়ে।

কিন্তু আমি ভয় পেয়েছিলাম...

তুমি চুপ ছিলে,
আমি দুর্বল ছিলাম। আমরা কেউ কিছু বলিনি। অথচ সেই ‘না বলা’র মাঝেই কত কিছু ছিল। আজ আমি অনেক
দূরে। কিন্তু মনে হয়, আমরা যেন আজও একসাথে হেঁটে চলেছি...
শুধু দূরত্বটা বেড়ে গেছে।

শুভ,

আমি জানি তুমি এখন হয়তো ভালো আছো, কারো পাশে আছো।

তবু একটা প্রশ্ন—

“যদি আবার দেখা হতো... তুমি কী বলতে আমাকে?”

— অনন্যা

শুভর প্রতিক্রিয়া...

চিঠিটা বারবার পড়ল শুভ।

একসময় চোখে জল চলে এলো।

সে জানে... এই চিঠিটা বলছে, যা সেইদিন বলা হয়নি।

কিন্তু এখন?

অনেক কিছু বদলে গেছে। সে এখন মেহরিনের পাশে দাঁড়ায়, কথা বলে, হাসে।

কিন্তু...

অনন্যার নামটা আজও বুকের ঠিক মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকে।

উপসংহার: (অধ্যায় ৬ : শেষ)

জীবন কখনো কখনো এক গোল চিঠি হয়ে ফিরে আসে—

ঠিক যখন তুমি ভাবো সব শেষ,
তখনই কেউ বলে —
“তুমি কি এখনো অপেক্ষা করো?”

শুভ হয়তো আর সেই মানুষটা নেই,

কিন্তু তার ভেতরের একটা কোণা আজও অনন্যার নামে বুক রাখে।

আর ভাবে —

“যদি আবার দেখা হতো... আমি হয়তো শুধু একটা কথাই বলতাম—
দেরি হয়ে গেছে, কিন্তু মন এখনও একই রকম।”

অধ্যায় ৭: শেষ কবিতা

কিছু অনুভব লেখা হয় না...

কেবল সুর হয়ে বেজে চলে হৃদয়ের অলিখিত কোনে।

এই অধ্যায় – শুভর মুখোমুখি হওয়া নিজের ভেতরের বাস্তবতার সাথে। অনন্যা আর মেহরিন – দুজনের মাঝে আটকে থাকা নিজের অস্তিত্বটাকে খুঁজে পাওয়ার চেষ্টা।

নতুন সকাল, পুরনো উপলব্ধি...

শুভ আর আগের মতো নেই। চেহারায় পরিবর্তন হয়নি, কিন্তু মনটা অনেক পরিণত। অনন্যার চিঠির পর কয়েক রাত ঘুম হয়নি তার।

মেহরিন বুঝে গেছে – কিছু কথা মানুষ চাইলেও বলতে পারে না।

একদিন মেহরিন ধীরে এসে বলে –

– “শুভ, আমি জানি তুমি আমার সঙ্গে আছো... কিন্তু মনটা কোথাও আটকে আছে। আমি চাই না তুমি নিজেকে ভেঙে ফেলো।”

– “আমি চাই, তুমি নিজেকে খুঁজে পাও... শুধু আমার জন্য নয়, নিজের জন্য।”

শুভর শেষ কবিতা... (ডায়েরিতে)

আজ আমি একা,

আকাশে সন্ধে নেমেছে...

তবু বুকুর ভিতরে আজ আলো।

তোমরা দুজন – দুই পাশে দাঁড়িয়ে,

একজন ছিলে, আর একজন আছো।

ভালোবাসা হয়তো সব প্রশ্নের উত্তর নয়,

কিন্তু কিছু মানুষ... প্রশ্ন হয়ে থেকেই যায়।

তোমার জন্য, অনন্যা... আমি ক্ষমা করি নিজেকে।

তোমার জন্য, মেহরিন... আমি আবার শুরু করি।

উপসংহার: (অধ্যায় ৭ : শেষ)

শুভ আর অনন্যার দেখা হয়নি।

হয়তো হবেও না।

মেহরিন একদিন শুভর হাত ধরে বলেছিল –

“ভুলে যাও, না। ভুলতে শেখো।”

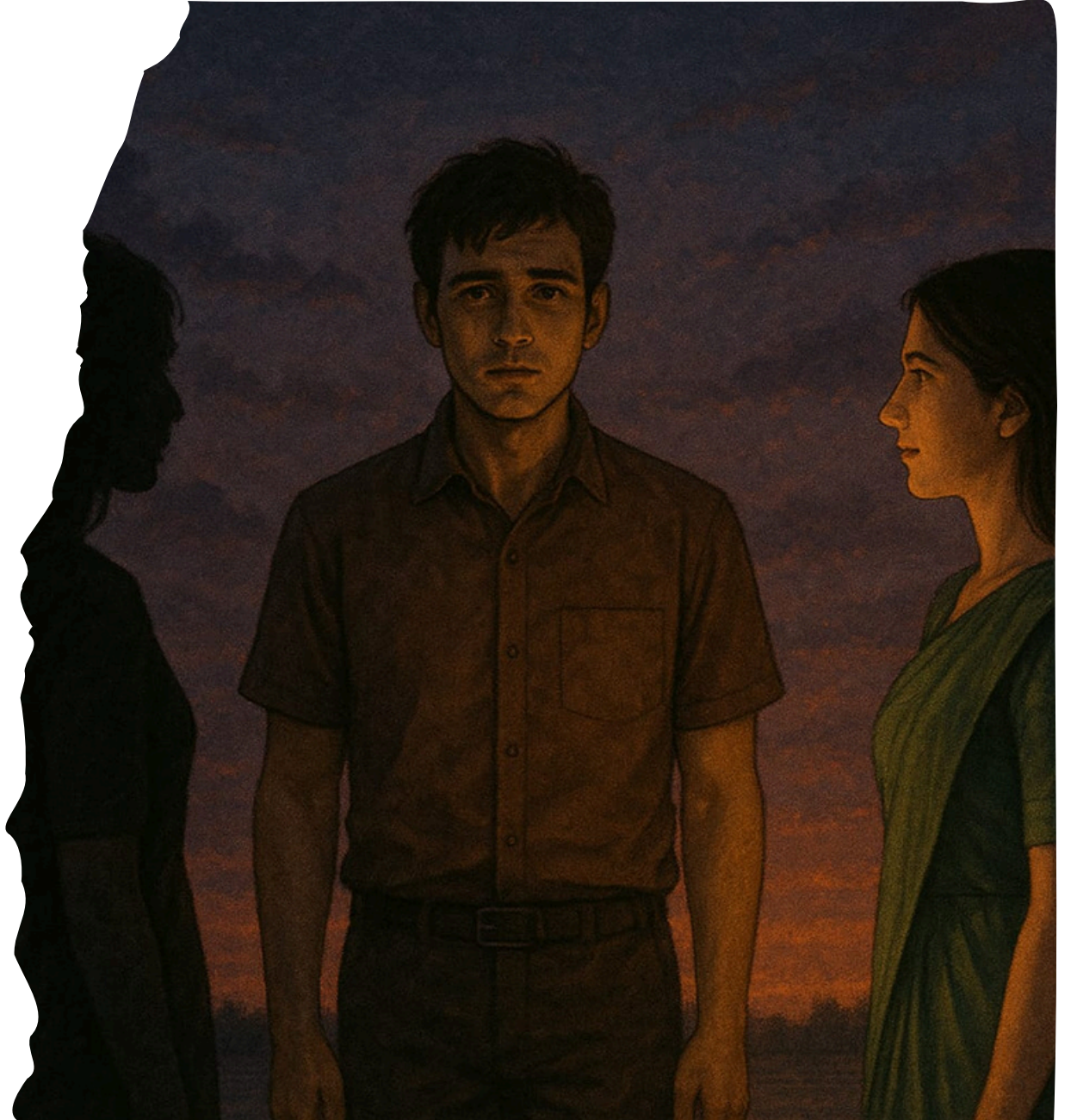
শুভ মনে মনে জানে, ভোলা যায় না, কিন্তু সামলে নেওয়া যায়।

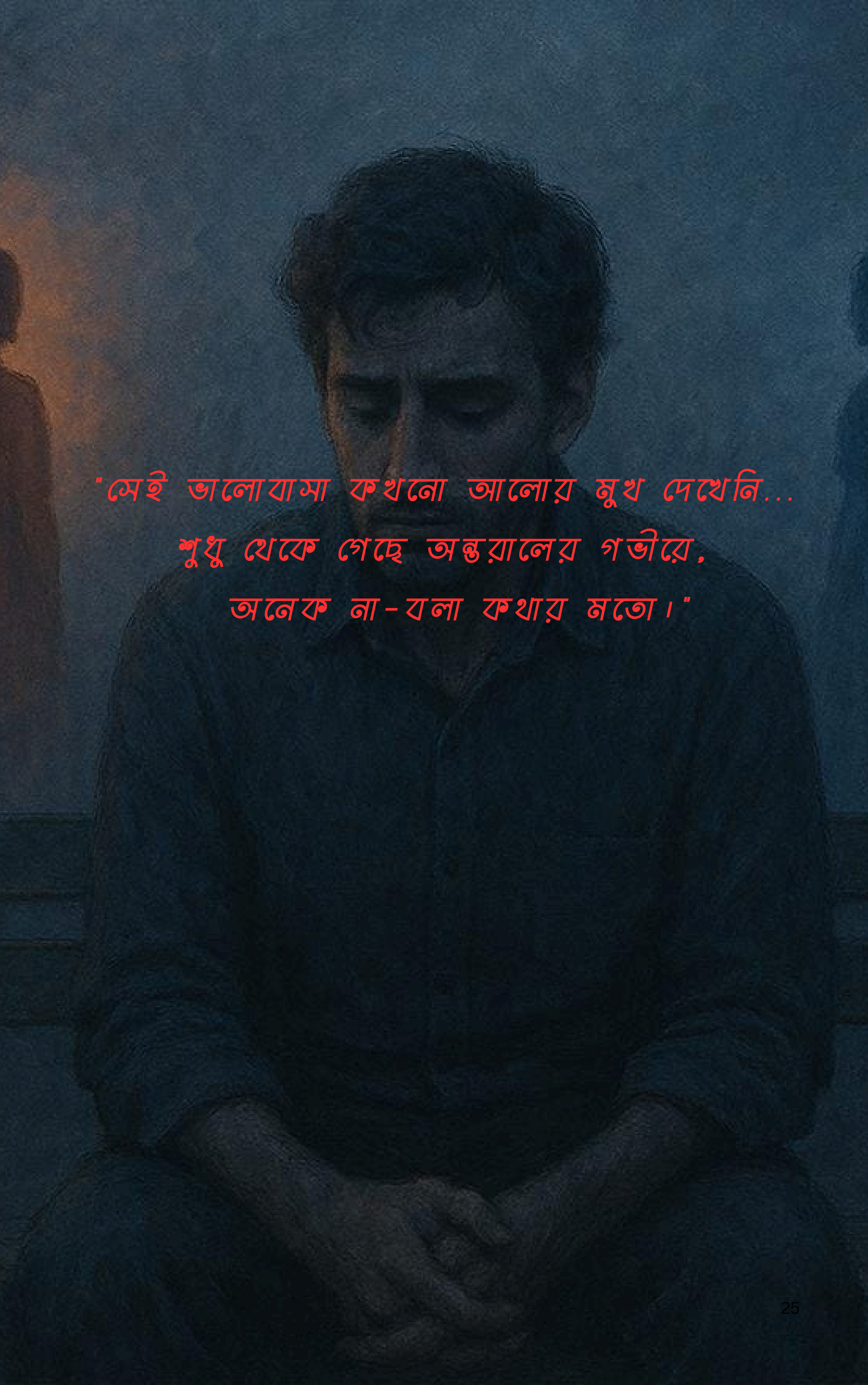
আর এটাই জীবন।

শেষ কবিতা কখনও শেষ হয় না।

শুধু তার ছন্দ বদলায়...

আর পাঠক শেখে— ভালোবাসা মানে পাওয়া নয়, অনুভব করা।





"মেই ভালোবাসা কখনো আলোর মুখ দেখেনি...
শুধু থেকে গেছে অন্তরালের গভীরে,
অনেক না-বলা কথা মতো।"